যাওয়া তো নয় যাওয়া

সিরাজুস সালেকিন

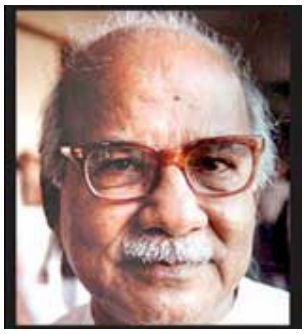

চলে গেলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় ওয়াহিদ ভাই। গহন ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন - এবং একেবারেই চলে গেলেন আমাদেরকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে। এত বড় মাপের মানুষ আজকাল আর তেমনটি দেখা যায় না। সঙ্গীত গুরু, সাংবাদিক, সংগঠক, দক্ষ সমালোচক, আবৃত্তিকার - কি ছিলেন না তিনি। একেবারেই নির্লোভ, অসাম্প্রদায়িক আর অমিত সাহসের অধিকারী ছিলেন আমাদের ওয়াহিদ ভাই। সত্য সাধনার প্রতিষ্ঠাই ছিল ওয়াহিদ ভাইয়ের মূল কর্মপ্রেরণা। ন্যায়, সুন্দর আর সত্যের প্রকাশেই ছিল তাঁর জীবনের বিস্তৃতি। এই অনন্যতা ওয়াহিদ ভাই পেয়েছেন হৃদয়ের অনুভব চেতনার শক্তি থেকে, এর সাথে যুক্ত হয়েছে তাঁর মস্তিস্কের চেতনা শক্তি। বাংলাদেশ আর এর মানুষকে তিনি ভালোবেসেছেন অকৃপণতায়, বাঙালিত্ব ছিল তাঁর ভূষন। আমাদের সব রকমের সমৃদ্ধিতে তিনি একাই ছিলেন আমাদের অনেকের গুরু, শিক্ষক আর বন্ধু। রবীন্দ্রনাথকে আমি যতটুকুই চিনেছি এবং তা আজও ধারন করে চলেছি, তা ওয়াহিদ ভাই এর সান্নিধ্যে এসেই। একথা বোধকরি আমার মত অনেকেই স্বীকার করবেন - যারা তাঁর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন।

বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চ্চার বিকাশে ওয়াহিদ ভাই এর অবদান অনন্য। সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানট এর মূল মানুষটি ছিলেন ওয়াহিদ ভাই আর সাথে ছিলেন সনজিদা আপা। ১৯৭৬ এ আমার ছায়ানটে গান শেখা শুরু থেকেই ওয়াহিদ ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ। প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষে গান শেখাতেন সনজিদা আপা, জাহেদুর রহিম আর সেলিনা মালেক। ৩য়, ৪র্থ আর শেষ বছরগুলোতে ওয়াহিদ ভাই আর সনজিদা আপা আমাদের ক্লাস নিতেন। গান শেখানোর আগে গানটির কথা, সুর, ভাব - এসবের ওপর একটি দীর্ঘ বক্তৃতা ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয়। মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতাম সে সব আলোচনা। কেমন করে এবং কেন গানটির কথার সাথে সুরের এমন মিল হোলো - তা জানতে পারলাম তখন থেকেই। এর পর তিনি যখন গানটি শেখাতেন, তখন এর মূল ভাবটি যেন চোখের সামনে ফুটে উঠতো সহজেই। আর তাঁর গান শেখানো - অতুলনীয়। কেমন করে স্বরে সুর লাগাতে হয় - এটি ও তাঁর কাছেই শেখা। আর কেউ ওনার মত করে রবীন্দ্রনাথের গান শেখাতে পারেন - এটা আমি এখনও বিশ্বাস করি না। কারণ তাঁর মত সঙ্গীতবোধ ও জ্ঞান খুব কম মানুষের পক্ষেই থাকা সম্ভব।

ক্রমে রবীন্দ্রনাথকে আরো বেশী করে জানার আগ্রহ হোলো এখান থেকেই। 'গান শিখতে ও বুঝতে হোলে এর প্রতি আসক্তি (এডিকশন) থাকতে হবে' - একথাটা ওয়াহিদ ভাইয়ের মুখে প্রায়ই শুনতাম। এ কথাটা যে কতটা সত্যি - তা আজ বুঝতে পারি সহসাই। অপ্রচলিত সব রবীন্দ্রসঙ্গীত, যেমন তোমার দেখা পাব বলে এসেছি হে সখা, তোমার মধুর রুপে ভরেছ ভূবন মুগ্ধ নয়ন, একি লাবণ্যে পূর্ন প্রাণ প্রানেশ হে, তোমারি সেবক কর হে আজি হতে আমারে, বুঝেছি কি বুঝি নাই বা, দীপ নিবে গেছে মম - এরকম আরও অনেক গান শিখেছি তাঁর কাছে। জোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিছু গান এবং ঠাকুরবাড়ির কিছু গানও আমরা শিখেছি ওনার কাছে। গানের ভিতর দিয়ে ভূবন দেখা - এটা আমাদের শিখিয়েছেন ওয়াহিদ ভাই।

ছায়ানটে আমাদের গানের ক্লাশ শেষ হবার পর আমরা ক'জন ওয়াহিদ ভাই এর পিছু পিছু ঘুরতাম - উদ্দেশ্য - আরও কিছু শেখা বা জানা। সানজিদা আপার বাসায় এরকম অনেক বৈঠক হোতো আমাদের, নতুন নতুন সব গান শিখাতেন, কথা বলতেন, আমরা তখন অন্য এক জগতে যেন আচ্ছন্ন হয়ে থাকতাম। 'তোমা মাঝে অসীমের চির বিস্ময়' - এ কথাটি বোধহয় শুধু ওয়াহিদ ভাই এর জন্যই প্রযোজ্য।

আমাদেরকে গাছ চেনাবার জন্য একবার নিয়ে গেলেন মিরপুর বোটানিকাল গার্ডেনে। এমন কোন গাছ নেই - যার নাম তিনি জানেন না - আমরা অবাক হোতাম তাঁর জ্ঞানের পরিধি দেখে। আর একবার আমরা (ছায়ানট) চিটাগং যাচ্ছি শ্যামা নৃত্যনাট্য মঞ্চায়ন করার জন্য - ট্রেনে বসে বসে আমার সাথে কমপিউটার ও সাইবারনেটিকস এর ওপর অবাক করা এক বক্তৃতা দিলেন যখন শুনলেন কমপিউটার এ কাজ করা আমার পেশা। এরকম কতবার যে অবাক হয়েছি তাঁর সর্ববিষয়ে জ্ঞানের বহর দেখে।

আমাদেরকে শুদ্ধ বাঙালি করে বড় করে তুলতে চেয়েছিলেন ওয়াহিদ ভাই। ছেলেরা পাজামা-পান্জাবী আর মেয়েরা তাতের শাড়ী ছাড়া অন্য কোন পোষাক পরে তাঁর ক্লাশে ঢোকা বারণ ছিল। সেই অভ্যাস আজও আমাদের (ছায়ানটের) অনেকের এখনো রয়ে গেছে। পাজামা-পান্জাবী ছাড়া অন্য কোন পোষাক পরে গান গাইবার কথা আমরা ভাবতেও পারিনা। পাজামা-পান্জাবী ছাড়া অন্য কোন পোষাকে ওয়াহিদ ভাইকে কখনও দেখিওনি। দেশকে, এর মানুষকে আর এর সংস্কৃতিকে ভালোবাসতে ও লালন করতে শিখিয়েছেন আমাদের এই সুরের গুরু, শিক্ষাগুরু। রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মিলন পরিষদের সাথে যুক্ত থাকাকালীন সময়ে বিভিন্ন জেলায় গান শেখাতে যেতাম ওয়াহিদ ভাইএর সাথে। কখনো সাথে থাকতেন অঞ্জলি দিদি, বন্যা অথবা মিতা। ছায়ানটেও আমি যে ক'বছর গান শিখিয়েছি - তাও ওয়াহিদ ভাইয়েরই প্রচ্ছন্ন সহযোগীতায়।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধে বেশ ক'জন শিল্পী নিয়ে একটা দল গঠন করলেন ওয়াহিদ ভাই। এ শিল্পীদল মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে ক্যাম্পে ও শরনার্থী শিবিরে গিয়ে দেশপ্রেমের সব গান

পরিবেশন করতো। অনেক পরে এর কিছু ফুটেজ উদ্ধার করে 'মুক্তির গান' নামে একটা ছবি তৈরী করেছে তারেক মাসুদ।

পাকিস্তান আমলে রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে অচলায়তন ভাঙার মূল কারিগর ছিলেন ওয়াহিদ ভাই। রবীন্দ্রনাথের গান, কবিতা আর নাচ দিয়েই গড়েছিলেন প্রতিরোধ। পাকিস্তানের ধর্মীয় মায়ামন্ত্র ভেদ করে বাঙালি যেন তার আপন স্বভাবে ফিরতে পারে - সে জন্যই ছিল তাঁর প্রচেষ্টা। সাম্প্রদায়িকতার বেড়াজাল থেকে বাঙালিকে জাতীয়তার মিলনক্ষেত্রে উত্তীর্ণ করতে তাঁর চেস্টা ছিল সময়োপযোগী এবং ফলপ্রসু। ছায়ানটের পহেলা বৈশাখের বাংলা নববর্ষ আজকে যে জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে - এর পেছনেও মূল মানুষটি হচ্ছেন ওয়াহিদ ভাই।

বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি গ্রামে তিনি গ্রামের সাধারন মানুষকে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখিয়েছেন, উন্নত করেছেন তাদের রুচিবোধ। এটি বোধহয় শুধু ওয়াহিদ ভাই এর পক্ষেই সম্ভব।

ওয়াহিদ ভাই শুধু একজন ব্যাক্তি ছিলেন না - তিনি নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান। সত্যকে সদা-সঙ্গী করে পথ চলতে তিনিই আমাদের শিখিয়েছেন। সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তার ব্যাপক কর্মোদ্যম আমাদের সবসময় অনুপ্রাণিত করেছে। সব অপসংস্কৃতির ও অন্যায় এর বিরুদ্ধে তার ক্ষুরধার লেখা বাঙালিকে বার বার উজ্জীবিত করেছে।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অবস্থার ওপর পত্রিকায় তাঁর নিয়মিত কলাম 'অভয় বাজে হৃদয় মাঝে' এ লেখাগুলি পড়লে তাঁর ক্রোধ ও হতাশার চিত্র ফুটে ওঠে। কেমন হওয়ার কথা ছিল বাংলা নামের দেশটির - আর আজ রাজাকার-আলবদরদের হাতে পড়ে কেমন চলছে দেশটি আর এর মানুষরা - এই ছিল তার মূল বিষয়বস্তু। মুক্তিযোদ্ধা ওয়াহিদ ভাইয়ের তো হতাশ হওয়ারই কথা।

যদিও আমরা সবাই জানি যে শরীরী অবয়বকে এই ভূবনমোহীনি কোলাহল ছেড়ে যেতেই হবে একদিন, তবুও এত বড় একজন মানুষ চলে যেতে পারেন না, তিনি মিশে থাকবেন আমাদের চেতনায়, শরীরে, মন ও মননে। তাঁর যাওয়া তো নয় যাওয়া।